মনের রসায়ণ ?

রতনলাল ব্রহ্মচারী

মাথা না থাকিলেও মাথা ব্যথা ?

প্রায় এ রকম একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখতে পেলেন কর্নিং আর জন নামক দু'জন বিজ্ঞানী। বছর দুই আগের কথা এরা কাজ করছিলেন প্লাচনেরীয়া নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র অমেরুদণ্ডী প্রাণী নিয়ে। একটা ইলেকট্রিক আলো দেখিয়ে এবং তার পরে একটা ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে ওদের উপর পরীক্ষা করা হচ্ছিল। শক্ পেয়ে তাদের দেহ কেঁপে ওঠে (Wriggling movement)। আস্তে আস্তে আলো দেখার সংগে সংগে তারা শক্ পাওয়ার মত কাঁপতে শিখল। এই বার তাদের "ট্রেনিং পাওয়া শিক্ষিত" মাথাগুলি কেটে ফেলা হল। কাজটা কিন্তু মোটেই নিষ্ঠুর নয়। কারণ এখন মাথা থেকে একটা নতুন দেহ এবং কাটা লেজ থেকে একটা নতুন মাথা গজাল, অথাৎ একটির জায়গায় দুটি প্রাণী তৈরী হল। এখন দেখা গেল পুরোনো মাথাওলা প্রাণীগুলি তো আলো দেখে কাঁপছেই, এমন কি নতুন মাথা-ওলারাও সেই শিক্ষা পেয়েছে। অর্থাৎ যেন পুরানো মাথার ব্যথা কি করে মাথাহীন শরীরে টিঁকে ছিল। এখন, সেটা নতুন মাথাতে চলে এসেছে। তাহলে একটি সহজ "স্মৃতি" অর্থাৎ মানসিক প্রতিক্রিয়ার একটি সরল রূপ কোন প্রকারে মাথা থেকে লেজে চলে এসেছে। পরে এঁরা দেখেছিলেন যে "শিক্ষিত" প্রাণীর দেহ খাইয়ে, অশিক্ষিত প্রাণীকেও এই স্মৃতির অধিকারী করা যায়। উপরোক্ত দুই বিজ্ঞানীর ধারণা হল এই স্মৃতি জিনিষটা মলিকিউলার ভিত্তিক এবং "আর এন এ" বস্তুটাই এই মলিকিউল।

কিন্তু কি করে এই ধারণা হল এবং আর এন এ পদার্থটাই বা কি ; অবশ্য তা না জানলেও, এই পরীক্ষার পরবর্তী অধ্যায়টা বোঝা যাবে।)

প্রায় ৮০ (আশী) বছর আগে মিশার নামক এক বিজ্ঞানী নিউক্লিক এ্যাসিড নামে এক পদার্থ আবিষ্কার করলেন। গত দশ বছরে এই পদার্থ বায়ো কেমিষ্ট এবং বায়োলজিষ্টদের কাছে আলা-দীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বংশানুক্রমতার মূলে, জীবনের প্রধান প্রধান রহস্যের মূলে, জীবদেহে প্রোটন সৃষ্টির মূলে সর্ব্বত্রই একে দেখতে পাওয়া যায়।

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, নিউক্লিক এ্যাসিড দু'জাতের ডি এন এ এবং আর এন এ। কিন্তু যেমন চার রংয়ের পুঁতি নিয়ে বহু রকমের এবং বহু দৈর্ঘ্যের মালা গাঁথা যায়, তেমনি বহু রকমের ডি এন এ এবং বহু রকমের আর এন এ সম্ভব কারণ এরা প্রধানত চার রকমের নিউক্লিও টাইড দিয়ে তৈরী।

ডি এন এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে যে সংবাদ সেইটা বহন করে নিয়ে আসে এক বার্ত্তাবহ দূত, তার নাম দূত আর এন এ। (মাত্র দেড় বছর আগে আবিস্কৃত)। তার পর সেই বার্ত্তা অনুযায়ী ঠিক ঠিক এ্যামিনো এ্যাসিড অনু ধরে নিয়ে আসে ট্রানস্ফার আর এন এ। তারপর রাইবোসোম কণার উপর তৈরি হয় এই এ্যামিনো এসিডের মালা অর্থাৎ নানা রকমের প্রোটিন যার সাহায্যে জীবদেহ পাচ্ছে আপন বৈশিষ্ট্য এবং বহু রকমের এনজাইম যার সাহায্যে শত শত বায়ো-কেমিক্যাল প্রক্রিয়া দেহটাকে জীবন্ত রাখছে।

বিরাট প্রাণী থেকে ক্ষুদ্র ভাইরাস্—সর্বত্র এই নিউক্লিক এ্যাসিড তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে।

এইবার ফিরে যাই প্লানেরীয়ার কাছে। গত কয়েক বৎসরে হাইডেন নামক এক বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে নার্ভকোষের বাইয়োকেমিক্যাল প্রক্রিয়া অতি চমকপ্রদ। গাইগার, হাইডেন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কাজের ফলে আমরা জানি যে একটা স্টিমুলেটেড় নার্ভ কোষের নিউক্লিও প্রোটিন বৃদ্ধি পায়, যদিও বেশী হলে সেগুলি ভেংগে যায়। হাইডেন বহু যুক্তি তর্কের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে চিন্তাধারার সংগে সংগে মস্তিষ্কে যে বৈদ্যুতিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তার জন্য, পুরনো, আর এন এ ভেংগে গিয়ে, নতুন ধরণের আর এন এ তৈরি হবে। গাইগার এর পক্ষে কিছু এক্সপ্যেরি-মেন্টাল প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। তবে কি একটা বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার সংগে এক একটা বিশেষ আর এন এ সংযুক্ত আছে।

এখন আমাদের সেই পুরণো বিজ্ঞানী বন্ধুরা ট্রেনিং পাওয়া প্লানেরীয়া গুলিকে দুই খণ্ডে কেটে, কতগুলি মাথা আর লেজ রাখলেন সাধারণ পুকুরের জলে, বাকিগুলি রাখলেন রিবো নিউক্লিয়েজ—মেশানো জলে। রিবোনিউক্লিয়েজ আর এন এ কে ধ্বংস করে দেয়।

সব ক্ষেত্রেই মাথাগুলি তাদের স্মৃতি ধরে রাখলো। সাধারণ জলে রাখা লেজের থেকে নতুন গজানো মাথায় সেই স্মৃতি দেখা গেল। কিন্তু রিবোনিউক্লিয়েজ মেশানো জলে রাখা লেজে সেই স্মৃতি গেল নষ্ট হয়ে। অতএব ধারনা করা হচ্ছে মাথা থেকে সেই আর এন এ ক্রমাগত তৈরী হতে পারে। কিন্তু লেজে আর নূতন করে তৈরী হতে পারে না। যা ছিল সেটা একবার নষ্ট হয়ে গেলে সেই সংগে স্মৃতিও যায় হারিয়ে।

এখন জানা গেছে যে Prof. হাইডেন বর্ত্তমানে এই ধরণের কাজ আরও উন্নততর প্রাণী যথা

ইঁদুর নিয়ে করছেন। একটা বিশেষ শিক্ষার ফলে (যেমন একটা গোলকধাঁধার ঠিক রাস্তা চিনতে শেখার পরে) ইঁদুরের নার্ভে রিবনিউক্লিওপ্রোটিনের কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে, সেই সব বিষয়ে অতি সূক্ষ্ম রাসায়নিক কাজ এখন Prof. হাইডেন করে চলেছেন।